বাংলাদেশ
জার্নাল
অব
পলিটিক্যাল
ইকোনমি

© ২০২১ বাংলাদেশ জার্নাল অব পলিটিক্যাল ইকোনমি
খণ্ড ১, সংখ্যা ১, ডিসেম্বর ২০২১, পৃষ্ঠা, ২৭৩-২৭৬
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
(আইএসএসএন ২২২৭-৩১৮২)

করোনায় বৃদ্ধি পাওয়া আয় বৈষম্য হ্রাসে করণীয়*

মতিউর রহমান**
শিশির রেজা***

অতিসম্প্রতি গণমানুষের অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত তাঁর "বড় পর্দায় সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র: ভাইরাসের মহাবিপর্যয় থেকে শোভন বাংলাদেশের সন্ধানে" শীর্ষক মাস্টারপিস গ্রন্থে গবেষণার মাধ্যমে তুলে ধরেছেন যে, কভিড-১৯ ও সংশ্লিষ্ট লকডাউন (২০২০ সালে ঘোষিত) বাংলাদেশের শ্রেণিকাঠামোতে আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছে। কভিড-১৯ এর কারণে বাংলাদেশের মানুষের আয়-বৈষম্য অতিমাত্রায় বেড়ে গেছে এবং এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য কী করণীয় সে সম্পর্কে তিনি নীতি-নির্ধারকদের জন্য মূল্যবান পরামর্শ প্রদান করেছেন।

শ্রেণিকাঠামোতে পরিবর্তন

অধ্যাপক আবুল বারকাত দেখিয়েছেন যে, ১৭ কোটি মানুষের বাংলাদেশে ২০২০ সালে কভিড-১৯ প্রতিরোধে সরকার কর্তৃক ঘোষিত লকডাউনের আগের শ্রেণিকাঠামো ছিল এ রকম: (দেশের মোট খানার মধ্যে) দরিদ্র ২০ শতাংশ, মধ্যবিত্ত ৭০ শতাংশ, ধনী ১০ শতাংশ। আর লকডাউনের পরে শ্রেণিকাঠামো সম্পূর্ণ পাল্টে হয়েছে এ রকম: দরিদ্র ৪০ শতাংশ, মধ্যবিত্ত ৫০ শতাংশ, ধনী ১০ শতাংশ। সুতরাং নিশ্চিত যে কভিড-১৯-এর কারণে মাত্র দুই মাসের মধ্যে ব্যাপক মানুষের শ্রেণিগত অবস্থান পাল্টে গেছে নিম্নগামী হয়েছে, অবনতি হয়েছে।

ড. বারকাত হিসেব করে দেখিয়েছেন, গত বছরের (২০২০ সালের) লকডাউনের আগে ফেব্রুয়ারি মাসের শেষের দিকে ১৭ কোটি মানুষের বাংলাদেশে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা ছিল ৩ কোটি ৪০ লক্ষ আর (ঠিক দুই মাস পরে) কভিড-১৯-এ লকডাউন করার দুই মাস পরে ৩১ মে (২০২০) নাগাদ এক লাফে ওই দরিদ্র শ্রেণির মানুষের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬ কোটি ৮০ লক্ষে। অর্থাৎ কভিড-১৯-এর কারণে মাত্র দুই মাসে নতুন করে দরিদ্র হয়েছেন ৩ কোটি ৪০ লক্ষ মানুষ। আবার দরিদ্রদের মধ্যে যারা

---

* পৃষ্ঠা-১৬, যুগান্তর ০৮ এপ্রিল ২০২১ প্রিন্ট সংস্করণ

** গবেষণা পরামর্শক, হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার (এইচডিআরসি), ঢাকা; ফোন: ০১৭৩১৪৬৮৯৬৯, ই-মেইল: motiursohel@gmail.com

*** পরিবেশ বিশ্লেষক ও সহযোগী সদস্য, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি; ফোন: ০১৯১৬৯৭১৫৭০, ই-মেইল: shishirmjs@gmail.com

হতদরিদ্র "যারা দিন আনে দিন খায়" (অথবা যাদের সরকারি পরিসংখ্যানে খানার আয়ের সর্বনিম্ন ১০ ডিসাইল হিসেবে ধরা হয়) তাদের সংখ্যা ছিল লকডাউনের আগে মোট খানার ১০ শতাংশ কিন্তু লকডাউনের ২ মাস পরে তাদের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ২৫ শতাংশ অর্থাৎ লকডাউনের আগে তাদের নিরঙ্কুশ সংখ্যা ছিল যেখানে মোট ১ কোটি ৭০ লক্ষ মানুষ, সেখানে লকডাউনের পরে (মাত্র ২ মাসের মধ্যে) সে মানুষের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪ কোটি ২৫ লক্ষ অর্থাৎ হতদরিদ্র গ্রুপে নতুন করে যুক্ত হয়েছেন ২ কোটি ৫৫ লক্ষ মানুষ। এরা লকডাউনের আগে দরিদ্র শ্রেণিতে ছিলেন– ৬৬ দিনে হতদরিদ্র গ্রুপে নেমে গেছেন। তিনি আরো দেখিয়েছেন যে, কভিড-১৯-এ মধ্যবিত্ত শ্রেণিকাঠামোতে পরিবর্তন হয়েছে ব্যাপক এবং বহুধা। লকডাউনের আগে ১৭ কোটি মানুষের বাংলাদেশে মোট মধ্যবিত্ত মানুষের সংখ্যা ছিল (মোট খানার ৭০ শতাংশ) ১১ কোটি ৯০ লক্ষ, যা লকডাউনের পর (মাত্র ২ মাসের ব্যবধানে) কমে দাঁড়িয়েছে ৮ কোটি ৫০ লক্ষ। অর্থাৎ মাত্র ২ মাসের মধ্যে কভিড-১৯ অতীতের ৩ কোটি ৪০ লক্ষ মধ্যবিত্ত গ্রুপের মানুষকে টেনে নিচে নামিয়ে ছেড়েছে। তিনি এই বইয়ে সমাজ পরিবর্তনের সম্ভাব্য শক্তি হিসেবে মধ্যবিত্ত শ্রেণির আবির্ভাব হওয়ার সম্ভাবনার কথাও বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে, মধ্যবিত্ত শ্রেণির সবাই একইরকম মধ্যবিত্ত নয়। মধ্যবিত্তদের মধ্যে বড় তিনটি উপশ্রেণি আছে: নিম্ন-মধ্যবিত্ত, মধ্য-মধ্যবিত্ত ও উচ্চ-মধ্যবিত্ত। অধ্যাপক বারকাত আরো উল্লেখ করেছেন যে, কভিড-১৯ (ও সংশ্লিষ্ট লকডাউন) এই তিন ধরনের মধ্যবিত্তের (মধ্যবিত্তের উপশ্রেণির) ওপর একই রকম প্রভাব ফেলেনি। তাঁর হিসেবে, লকডাউন সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করেছে নিম্ন-মধ্যবিত্তের: লকডাউনের আগে নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণিতে ছিলেন মোট ৫ কোটি ১০ লক্ষ মানুষ, যাদের সংখ্যা লকডাউনের ৬৬ দিনের মাথায় হয়েছে ৩ কোটি ৯১ লক্ষ অর্থাৎ মাত্র ২ মাসের মধ্যে হারিয়ে যাওয়া ১ কোটি ১৯ লক্ষ নিম্ন-মধ্যবিত্ত মানুষ আসলে হারিয়ে যাননি, তারা দরিদ্র শ্রেণিতে যোগ দিতে বাধ্য হয়েছেন। মধ্য-মধ্যবিত্তের মানুষের অবস্থাও নাকাল। লকডাউনের আগে তারা ছিলেন মোট খানার ২০ শতাংশ আর লকডাউনের (২ মাস) পরে নেমে এসেছেন ১৪ শতাংশে অর্থাৎ ৩ কোটি ৪০ লক্ষ মধ্য-মধ্যবিত্তের সাইজ সংকুচিত হয়ে এখন তা ২ কোটি ৩৮ লক্ষ হয়েছে। অর্থাৎ ১ কোটি ২ লক্ষ মধ্য-মধ্যবিত্তদের ৮০ শতাংশ নিম্ন-মধ্যবিত্ত গ্রুপে আর ২০ শতাংশ দরিদ্র গ্রুপে যোগ দিয়েছেন। উচ্চ-মধ্যবিত্তরাও কিন্তু আগের জায়গায় নেই। লকডাউনের আগে দেশে উচ্চ-মধ্যবিত্তরা (মধ্যবিত্ত শ্রেণিতে সবচেয়ে উপরে যাদের অবস্থান) ছিলেন মোট খানার ২০ শতাংশ লকডাউনের পরে যা নেমে এসেছে ১৩ শতাংশে। অর্থাৎ লকডাউনের আগে উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেণিতে মানুষের সংখ্যা ছিল ৩ কোটি ৪০ লক্ষ, যা লকডাউনের পরে নেমে এসেছে ২ কোটি ২১ লক্ষে। অর্থাৎ উচ্চ-মধ্যবিত্তদের মধ্যেও ১ কোটি ১৯ লক্ষ মানুষ শ্রেণি মইয়ে নিচের দিকে চলে গেছেন, সম্ভবত যোগদান করেছেন মধ্য-মধ্যবিত্ত গ্রুপে। তবে এদের মধ্যে নগণ্যসংখ্যক শ্রেণি মইয়ে উঠে ধনীও হয়ে যেতে পারেন (কারণ মহামারি অবস্থায় বিভিন্ন কারণে কিছু মানুষের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়)। তিনি দেখিয়েছেন, শ্রেণি মইয়ের সবচেয়ে উপরে বসবাসকারী ধনীদের (অতি ধনীসহ) অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়নি বরং তাদের কারো কারো অবস্থা আরো ভালো হয়েছে। গবেষক বারকাত দেখিয়েছেন যে, কভিড-১৯-এর ফলে মাত্র ২ মাসের ব্যবধানে বাংলাদেশের শ্রেণিকাঠামো পুরো পাল্টে গেছে। ১৭ কোটি মানুষের বাংলাদেশে লকডাউনের আগের তুলনায় লকডাউনের পরে (মাত্র ৬৬ দিনের মধ্যে) কমপক্ষে ৫ কোটি ১০ লক্ষ মানুষ শ্রেণি মইয়ে নিচের দিকে নেমে গেছেন। এই যে ৫ কোটি ১০ লক্ষ মানুষ লকডাউন থাকার মাত্র ২ মাসের মধ্যে শ্রেণি মইয়ে উপর থেকে নিচের দিকে নামতে বাধ্য হলেন তারা কারা? লকডাউনের আগের মাসেও–ফেব্রুয়ারি মাসে তাদের মধ্যে ১ কোটি ৭০ লক্ষ মানুষ ছিলেন দরিদ্র, যারা হতদরিদ্র গ্রুপে নেমে গেছেন (দরিদ্র শ্রেণিতেই আছেন

তবে দরিদ্রতর হয়েছেন), ১ কোটি ১৯ লক্ষ মানুষ ছিলেন নিম্ন-মধ্যবিত্ত যারা দরিদ্র শ্রেণিতে যোগ দিতে বাধ্য হয়েছেন, ১ কোটি ২ লক্ষ মানুষ ছিলেন মধ্যবিত্ত যারা প্রধানত নিম্ন-মধ্যবিত্ত গ্রুপে যোগ দিতে বাধ্য হয়েছেন, আর ১ কোটি ১৯ লক্ষ উচ্চ-মধ্যবিত্ত যারা মধ্য-মধ্যবিত্তে যোগ দিতে বাধ্য হয়েছেন। লকডাউনের ৬৬ দিনে শ্রেণি মইয়ের উপর থেকে নিচে নামতে বাধ্য হওয়া মানুষের সংখ্যা ৫ কোটি ১০ লক্ষ নয়, আসলে সে সংখ্যা হবে ৬ কোটি ৮০ লক্ষ। এ দুই সংখ্যার যে পার্থক্য ১ কোটি ৭০ লক্ষ মানুষ তারা আসলে হতদরিদ্র ছিলেন, আর লকডাউনে হয়েছেন নিঃস্ব-ভিক্ষুক।

আয়-বৈষম্য বৃদ্ধি

অধ্যাপক আবুল বারকাত তাঁর বই-এ উল্লেখ করেছেন যে, কভিড-১৯ যে শুধু শ্রেণিকাঠামো পাল্টে দিয়েছে তা-ই নয়–মারাত্মক কথা হলো করোনার লকডাউন দেশে আয় বৈষম্য বাড়িয়েছে, এবং তা বাড়িয়েছে খুবই বিপজ্জনক মাত্রায়। তিনি লিখেছেন: যদি ধনীদের অবস্থা (এমনকি) অপরিবর্তিত থাকে আর অন্যসব শ্রেণির অধোগতি হয়, তাহলে বৈষম্য বাড়তে বাধ্য। ঠিক সেটাই ঘটেছে কভিড-১৯-এ লকডাউনের কারণে বাংলাদেশে (সম্ভবত বিশ্বের সব দেশে)। অধ্যাপক বারকাতের হিসেবে কভিড-১৯ দেশের খানার মোট আয় বণ্টনে বড় ধরনের প্রভাব ফেলেছে। যেমন লকডাউনের আগে দরিদ্র শ্রেণি ছিল মোট খানার ২০ শতাংশ আর দেশের খানার মোট আয়ে তাদের হিস্যা ছিল ৩.৮৫ শতাংশ আর লকডাউনের ৬৬ দিন পরে খানার সংখ্যায় তারা দ্বিগুণ বেড়ে হয়েছে ৪০ শতাংশ আর দেশের খানার মোট আয়ে তাদের হিস্যা হয়েছে ৬.১২ শতাংশ (আগের দরিদ্র অবস্থায় থাকলেও সেটা হবার কথা ৭.৭ শতাংশ)। দেশের মোট খানার আয়ে মধ্যবিত্তের হিস্যা ছিল লকডাউনের আগে ৫৮.০৭ শতাংশ, যা লকডাউনের পরে নেমে গেছে ৪৭.৭৯ শতাংশে। দেশের খানার মোট আয়ে হিস্যা বেড়েছে ধনীদের লকডাউনের আগে ছিল ৩৮.০৯ শতাংশ, যা লকডাউনের ২ মাসের মধ্যে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৬.০৯ শতাংশ আর তুলনামূলক সবচেয়ে বেশি বেড়েছে অতিধনী'দের তাদের হাতে এখন দেশের মোট আয়ের ৩৭.৮০ শতাংশ, যা লকডাউনের আগে ছিল ২৭.৮২ শতাংশ। তাহলে কভিড-১৯-এর লকডাউন শুধু শ্রেণিকাঠামোই বদলে দেয়নি আয় বৈষম্যও বাড়িয়েছে, যা নিঃসন্দেহে অন্যান্য বহু ধরনের বৈষম্য বৃদ্ধির লক্ষণ।

আয় বৈষম্য' মারাত্মক বলা হয় তখন, যখন বৈষম্য নির্দেশক গিনি সহগ/জিনি সহগ-এর মান ০.৫ অতিক্রম করে; গিনি সহগ বাড়তে থাকা মানে আয় বৈষম্য বাড়তে থাকা, আর তা যত বাড়বে তত খারাপ হবে। আয় বৈষম্য মারাত্মক বিপজ্জনক' বলা হয় যখন পালমা বা পা'মা অনুপাত সংখ্যাটি ৩-এর কাছাকাছি বা ৩ অতিক্রম করে। লকডাউনের আগে আমাদের গিনি সহগ ছিল ০.৪৮২, যা লকডাউনের ৬৬ দিন পরে হয়েছে ০.৬৩৫; আর লকডাউনের আগে পালমা অনুপাত ছিল ২.৯২, যা লকডাউনের পরে এখন ৭.৫৩ (বিপৎসীমার দ্বিগুণেরও বেশি)। সুতরাং কভিড-১৯ বাংলাদেশকে উচ্চ আয় বৈষম্যের দেশ এবং বিপজ্জনক আয় বৈষম্যের'-এর দেশে রূপান্তরিত করে ছেড়েছে।

করণীয়

এমতাবস্থায়, অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত দেশের উন্নয়ন কৌশল প্রণয়নকারী নীতিনির্ধারকের উদ্দেশ্যে সুস্পষ্ট ও সরাসরি প্রস্তাব প্রদান করেছেন। তাঁর মতে, আয়-সম্পদ বৈষম্য হ্রাসের যত পথ-পদ্ধতি আছে তার সবই যত দ্রুত সম্ভব আশু, উন্নয়ন পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন

যে, এ বিষয়টির প্রতি যথাযথ গুরুত্ব না দিলে মহাবিপদ সমাসন্ন। তিনি দৃঢ়ভাবে উল্লেখ করেছেন যে এ মহাবিপদ থেকে মুক্তির পথ বের না করতে পারলে দেশে সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক অস্থিরতা এমন পর্যায়ে যেতে পারে, যখন শাসকগোষ্ঠীর আর করার কিছুই থাকবে না; ক্ষমতা বিপদাপন্ন হবে।

দেশের সার্বিক অবস্থা বিশেষ করে কভিড-১৯-উদ্ভূত লকডাউনের সম্ভাব্য প্রভাব-অভিঘাত বিশ্লেষণে তিনি প্রস্তাব করেন যে আগামী অন্তত পাঁচ বছরের বাজেটে ও অন্যান্য পরিকল্পনা ও উন্নয়ন নীতিকৌশল দলিল প্রণয়নে যে বিষয়টি নীতিনির্ধারকদের প্রধানতম ভিত্তিনীতি হিসেবে গ্রহণ করতেই হবে তা হলো: সমাজ থেকে চার ধরনের বৈষম্য– আয় বৈষম্য, ধন-সম্পদের বৈষম্য, স্বাস্থ্য বৈষম্য ও শিক্ষা বৈষম্য চিরতরে নির্মূল করা (প্রাথমিক স্তরে হ্রাস করা)। এ লক্ষ্যকে প্রধান লক্ষ্য বিবেচনায় রেখে বাজেটের আয় খাত (বাজেটের ভাষায় অর্থায়নের উৎস) ও ব্যয় খাত (বাজেটের ভাষায় সম্পদের ব্যবহার)-এ মৌলিক কাঠামোগত পরিবর্তন করতে হবে। বাজেটে অর্থায়নের উৎস (অর্থাৎ বাজেটে সরকারের আয় খাত) নির্ধারণে কোনোভাবেই যা করা যাবে না, তা হলো– দরিদ্র ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত– এই দুই শ্রেণির ওপর কোনো ধরনের কর-দাসত্ব আরোপ করা যাবে না; বিপরীতে দৃঢ়তার সাথে ধনীদের সম্পদ পুনর্বণ্টন করে তা শ্রেণি মইয়ের নিচের দিকে প্রবাহিত করতে হবে। আর এ কর্মকাণ্ডে পথ-পদ্ধতির মধ্যে থাকবে: যথেষ্টবেশি হারে সম্পদ কর আরোপ, অতিরিক্ত মুনাফার ওপর কর আরোপ (যা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে জরুরি অবস্থায়, মহামন্দা সময়ে ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আরোপ করা হয়েছিল), পাচারকৃত অর্থ উদ্ধার ও অর্থ পাচার রোধ, কালোটাকা উদ্ধার ও কালোটাকা সৃষ্টির পথ-পদ্ধতি রোধ করা; ধনীদের (সে যেই হোক না কেন, যে ব্যবসায়েরই হোক না কেন, যে শিল্পেরই হোক না কেন) নগদ অর্থে কোনো ধরনের প্রণোদনা প্রদান না করা। আর বাজেটে ব্যয়-বরাদ্দ (সম্পদের ব্যবহার) নির্ধারণের ক্ষেত্রে 'বৈষম্য হ্রাসকারী উন্নয়নদর্শনের' নিরিখে সেসব খাত উপখাত-ক্ষেত্রকেই প্রাধান্য দেয়া, যা আপাতত বড় মাত্রায় বহুমুখী বৈষম্য হ্রাস করবে (পরবর্তীতে উচ্ছেদ করবে) হ্রাস করবে আয় বৈষম্য, ধন বৈষম্য, স্বাস্থ্য বৈষম্য ও শিক্ষা বৈষম্য। এ বিবেচনা থেকে অগ্রাধিকার দিতে হবে অনানুষ্ঠানিক সেক্টরের প্রায় সকল কর্মকাণ্ড (দেশের ৮৫ শতাংশ শ্রমজীবী মানুষ, যাদের সংখ্যা হবে মোট ৬ কোটি ৮২ লক্ষ ৮ হাজার শ্রমশক্তির মধ্যে সাড়ে ৫ কোটি), যার মধ্যে আছে বিভিন্ন ধরনের অণু ও ক্ষুদ্র ব্যবসা ও শিল্প—কুটির শিল্প, কৃষি খাতশস্য ও শাকসবজি, প্রাণিসম্পদ-মৎস্যসম্পদ-জলজসম্পদ, স্বাস্থ্য খাত। জরুরি ভিত্তিতে জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা সিস্টেম' প্রতিষ্ঠাসহ; সামাজিক সুরক্ষা ও নিরাপত্তাবেষ্টনী ও শিক্ষা ও গবেষণা।